রাবীয়াতুর রায়

অনুবাদ ও সম্পাদনা: আব্দুল্লাহ আল বাক্বী
(ড. রাফাত পাশা রচিত 'ছুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেঈন' অবলম্বনে)

بســـم الله الرحمن الرحـــيم

বাহাদুর সিপাহ সালার ফররুখ ফিরে এলেন মদীনায়।সাথে অঢেল সম্পদ।তবে সব চেয়ে বড় যে জিনিষটি তিনি সাথে নিয়ে এলেন তা হ'ল 'স্বাধীনতা' অর্থাৎ গোলামীর শৃঙ্খল হতে চির মুক্তির তাজা অনুভূতি।

তিনি যখন মদীনায় ফিরে এলেন তখন তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ যুবক। শিরায় তার উত্তপ্ত খুনের স্ফুলিঙ্গ। বুকে অন্তহীন সাহস।সামনে তার জীবনের ৩১তম বসন্ত।সিদ্ধান্ত নিলেন বসবাসের জন্য একটি বাড়ী আর সুখের সংসার গড়াতে একজন জীবন সঙ্গিনী দরকার।

তিনি মদীনার অন্যতম প্রশস্ত একটি বাড়ী খরিদ করলেন।আর জীবন সাথী হিসেবে পছন্দ করলেন একজন মহিলাকে; যিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, সম্ভ্রান্তা, নির্ভেজাল দ্বীনের অনুসারিণী এবং বয়সে প্রায় তাঁর সমসাময়িক।

ফররুখ বাড়ী খরিদ করে ধন্য ও গর্বিত হলেন; যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন।

আর জীবন সঙ্গিনীর সংস্পর্শে এসে তিনি সব কিছুর চাইতে বেশি খুঁজে পেলেন জীবনের সুখ, অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য, সুরভিত ঘনিষ্ঠতা এবং জীবনের সজীবতা।

তাঁর বাড়ীটি একটি আদর্শ বাড়ীর সব ক'টি বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী, পরহেজগার এবং আল্লাহ প্রদত্ত গুণাবলী বহন কারিণী মুহসিনা নারী।

সংসার পাতার পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই ফররুখ ধীরে ধীরে যুদ্ধে অশ্বারহনের আকর্ষণ আবিষ্কার করেন হৃদয় গহিনে।রণাঙ্গনে অস্ত্রের সাথে অস্ত্রের আঘাতের ঠন্ ঠনা ঠন্ আওয়াজ শুনার জন্য তাঁর কান উৎকর্ণ হতে থাকে।নতুন কোন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাঁর বুকের মধ্যে জেগে উঠে নতুন নতুন অনুরাগ।

আর তাই যখনই ইসলামী যোদ্ধাদের বিজয়ের সু-সংবাদ মদীনার রাস্তায় রাস্তায় আনন্দের তরঙ্গ সৃষ্টি করত, তখনই তাঁর জিহাদের আসক্তি উছলে উঠত কলিজার উপকূলে এবং শাহাদাতের শীর্ষ মর্যাদা লাভের উদগ্র নেশায় অস্থির হয়ে উঠত তার মন।

কোন এক জুমার দিন।মসজিদে নববীতে খুৎবা দিচ্ছেন সম্মানিত খত্বীব।হৃদয় ছোঁয়া ও দেজদীপ্ত বক্তব্যের এক পর্যায়ে খত্বীব সাহেব বিভিন্ন রণাঙ্গনে সৈন্যদের নতুন নতুন বিজয়ের শুভ সংবাদ উপহার দিলেন সমবেত জনতাকে।সাথে সাথে আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল মুসলিম জনতার তাজা হৃদয়ে।আর তার পরেই মুহতারাম ইমাম সাহেব ইসলামের সোনালী অতীতের জীবন্ত কয়েকটি মেছাল টেনে এক জ্বালাময়ী ভাষণ পরিবেশন করলেন।উত্তপ্ত করে তুললেন প্রতিটি হৃদয়কে জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য।আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিকে পুঁজি করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য শাহাদাতের উদগ্র প্রেরণা যেন উন্মাদ করে তুলল সকলকে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন অকুতোভয় ফররুখ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম তারকাদের অধীনে ইসলামী পতাকার নিচে আবার তিনি জিহাদে শরীক হতে চান। সলাত শেষ হতেই বাড়ী ফিরে গেলেন তিনি। মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে স্ত্রীকে সংকল্পের কথা খুলে বললেন আর বললেন তাঁর জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিতে।

স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছু ক্ষণ। কি যেন ভাবলেন। তার পর বললেন- আমার গর্ভে প্রথম আল্লাহর নেয়ামত, তোমার সন্তান। আর আপনি মদীনায় নবাগত এক মুহাজির। এখানে আপনার নিকটাত্মীয় বলতে কেউ নেই। তাহলে আমার এই প্রথম বিপদে আমাকে আপনি কার কাছে রেখে যাচ্ছেন?

'আল্লাহর কাছে তোমাকে রেখে যাচ্ছি' জবাব দিলেন ফররুখ। তার পর বললেন: আর হ্যাঁ, তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি ত্রিশ হাজার দীনার। যা আমি এপর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধে গনিমত হিসেবে অর্জন করেছি। তুমি তা হেফাজত করবে আর তোমার নিজের এবং তোমার নবজাত অতিথির জন্য প্রয়োজন মত এবং ন্যায় সংগত ভাবে খরচ করবে; কোন দিন আমি সুস্থ ভাবে গনিমত নিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব অথবা শাহাদাত লাভে ধন্য হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবো।

একটু পর স্ত্রী অশ্রু ভেজা ঝাপসা চোখে আর একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অশ্ব খুরের ম্রিয়মাণ আওয়াজ।

স্বামীকে বিদায় দেয়ার কয়েক মাসের মাথায় গর্ভবতী স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করলেন। উজ্জ্বল মুখাবয়ব, মিষ্টি গড়ন এবং দৃষ্টি নন্দন চেহারার এক অপূর্ব সুন্দর পুত্র সন্তান। সন্তানের দিকে তাকিয়ে মা এতো অধিক খুশি হলেন যে, স্বামীর বিরহ তিনি ভুলে গেলেন।

সন্তানের নাম রাখলেন 'রাবীয়াহ'।

হাতের নখ শক্ত হওয়ার আগে থেকেই শিশুর মধ্যে আভিজাত্যের ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তার কথা ও কাজের মধ্যে তীক্ষ্ণ মেধার আলামত খুঁজে পান তার মা। মায়ের আদরে বেড়ে উঠে শিশু রাবিয়া। একদিন সন্তানের হাত ধরে মা নিয়ে যান শিক্ষকের নিকট। শিক্ষককে অনুরোধ করেন উত্তম শিক্ষা দান করার জন্য। আরও বললেন, সন্তানের আদব আখলাক যেন সুন্দর হয় এমন শিক্ষা দিতে। তারপর সন্তানের জন্য দুয়া করতে করতে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

কিছু দিন যেতে না যেতেই রাবীয়া পড়ার সাথে সাথে হাতের লিখাও আয়ত্ত করে নিল। হিফজ করে ফেলল পবিত্র আল কুরআন। আর এমন সাবলীল ও প্রাণবন্ত তিলাওয়াত সে উপহার দিচ্ছিল; ঠিক যেমনটা নাযিল হয়েছিল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্বলবের উপরে। সাধ্যমত হাদীছে রাসূলও মুখস্থ করে ফেলল। দ্বীনের আবশ্যকীয় জ্ঞান আহরণ করার পাশাপাশি আরবী ভাষায় এতোটা দক্ষতা অর্জন করলো যে তার সহপাঠীরা হয়রান হয়ে যেত।

খুশিতে আত্মহারা মা প্রচুর পরিমাণে পুরষ্কার এবং সম্পদ উপহার দিলেন মুহতারাম শিক্ষক মহোদয়কে। এমনকি সন্তানের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি শিক্ষক মহোদয়ের সম্মানীও বৃদ্ধি করে দিতেন।

এক দিকে তিনি স্বামীর আগমনের প্রহর গুনতেন অপর দিকে আশা করতেন সন্তান যেন তাদের উভয়ের চক্ষু শীতল করে। অন্তহীন অপেক্ষা যেন শেষ হতে চায়না। কিন্তু ফররুখের অন্তর্ধান অনেক অনেক দীর্ঘ হতে লাগল। তার সম্পর্কে মানুষের মুখে মুখে নানা কথা চর্চা হতে শুরু করল। কেউ বলল: উনি দুশমনদের হাতে বন্দি হয়েছেন। কেউ বলে: তিনি তো সারা জীবন জিহাদের ময়দানেই কাটাতে চান। আর এক দল লোক এই মন্তব্য আবিষ্কার করল যে তিনি শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন। কারণ তিনি সর্বদায় এর জন্য উৎসাহিত থাকতেন।

বিভিন্ন ভাবনা ও চিন্তা এসে বার বার জড়িয়ে ধরে উম্মু রাবীয়াকে। কি হতে পারে তার স্বামীর? কেন এতো দিনেও তিনি ফিরে আসছেন না? কোন সংবাদও নেই কেন? অবাঞ্ছিত এক পশলা আশংকা এসে তাকে কাঁপিয়ে

দিয়ে যায়।জনগণের শেষ মন্তব্যটিই তার কাছে বার বার প্রাধান্য পাচ্ছে। মনের আকাশে বার বার ভেসে উঠছে যে, তিনি বেঁচে থাকলে অবশ্যই কোন খবর পাঠাতেন।.....আর ভাবতে পারেন না তিনি।বেদনার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে তার উপর।যেন কোমল হৃদয়টা চুরমার হয়ে যাবে।উত্তম ভাবে ধৈর্য ধরেন তিনি এবং স্বামী হারানোর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে ধৈর্যের পারিতোষিক কামনা করেন।সে সময় রাবীয়াহ কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দরজায় পা রাখতে যাচ্ছে।

জীবনের এই সন্দিক্ষণে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এলো- আগামী দিন গুলোতে তিনি কি করবেন! জ্ঞান পিপাষু এই নওজোয়ান জীবনের পেশা হিসেবে স্বাধীন ভাবে যা বেছে নিলেন তা হ'ল জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান বিতরণ। যিনি জানেন তার কাছ থেকে তিনি জানবেন এবং যিনি জানেন না তাকে তিনি তা'লীম দিবেন।যা জানেন না তা শিখবেন আর যা জানেন তা অন্যকে শেখাবেন।আগামী জীবন তিনি এভাবেই কাটাবেন।এটি তার পেশা, এটিই তার নেশা।

পথ চলা শুরু হল রাবীয়ার।দীর্ঘ যে পথের ছক এঁকেছেন তিনি নিজের জীবনের মানচিত্রে, সে পথ ধরে এগিয়ে চলছেন তো চলছেনই।জ্ঞানাহরণের লক্ষে তিনি ঐ সব হালাকায় অংশগ্রহণ করতেন, যেগুলো সে সময়ে ইলমে ওয়াহির তরঙ্গ সৃষ্টি করত মসজিদে নববীতে।এসব ক্লাসে তার অংশ গ্রহণ ছিল যেমন মিষ্টি পানির কাছে কোন মরুচারী তৃষ্ণার্তের আগমন।মহান সাহাবীগণের সর্ব শেষ যে দলটি তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলেন তিনি তাদের সাথে লেগে থাকতেন জ্ঞান চর্চায়।এদের শীর্ষে ছিলেন: জ্ঞানের সাগর আনাস বিন মালিক রা:।তবে তিনি জ্ঞান-অর্জনের উষ্ণ পিপাসা বেশি নিবারণ করেছেন যাদের কাছে তাঁরা হলেন প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ীনগণ। তাঁদের বেশিরভাগে ছিলেন: সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, মাকহুল আশ্শামী, সালামাহ ইবনু দীনার প্রমুখ।এরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের ইতিহাসে একেক জন উজ্জ্বলতম সূর্য।

জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি এতো কঠোর অধ্যবসায় ও সাধনা শুরু করেন যে, দিনের ক্লান্তি উপশম না হতেই রাতের ক্লান্তি যোগ হতো।ক্রমাগত পরিশ্রমে তিনি জীর্ণ হয়ে গেলেন।কোন ব্যক্তি তাকে তার স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তাদেরকে বলতেন: আমি আমার শাইখদেরকে বলতে শুনেছি "ইলম তার কিছুই তোমাকে দেবে না, যতক্ষণ তুমি তোমার সর্বস্ব তাকে উজাড় করে না দেবে"।

অল্প দিন পরেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আড্ডায় লোকদের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলেন এই নওজোয়ান।তার সঙ্গী সাথীও বৃদ্ধি পেতে থাকলো।আর ইলমের জগতে নক্ষত্রের মতই চমকাতে শুরু করলো এই যুবক।এবার জ্ঞান পিপাসী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল তার দিকে এবং তারা তাকে নিজেদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের সর্দার হিসেবে আবিষ্কার করলেন।

এখন তাকে কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয় তার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক মা'র খেদমতে, কিছু ব্যয় করেন একান্ত সাথী ও বন্ধুদের সাথে ইলমে নাফে' তাকরার করতে, আর বাকী সময় ব্যয় করতে হয় মসজিদে নববীর বিভিন্ন হালাক্বায় অপেক্ষমাণ অসংখ্য শিক্ষার্থীদের জন্য।সময়ের আবর্তনের এক পর্যায়ে মসজিদে নববীর প্রধান জ্ঞান বিতরণকারী কিংবদন্তী এখন তিনি।এক মজলিস শেষ হতেই আর এক মজলিস বসছে আরও বড় হয়ে।.....

গ্রীষ্মের এক চাঁদনী রাত।মসজিদে নববীর সামনে এসে থামল এক অশ্বারোহী।জীবনের ছয়টি দশক পাড়ি দিয়েছেন তিনি।সবে মাত্র ঈশার সলাত শেষ হয়েছে।মুসল্লিরা সলাত শেষে তার পাশ দিয়েই বেরিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না অচেনা এই আগন্তুককে।না তাকাচ্ছে তার ঘোড়ার দিকে আর না ভ্রুক্ষেপ করছে তার

কাঁধে ঝুলানো তরবারির দিকে।এখানকার মানুষের নীরবতা তার হৃদয়ের কোনে লুকানো পেরেশানি একটুখানি বাড়িয়ে তুলল।তবে এই ভেবে শান্তনা পেলেন যে, ইসলামী শহরের অধিবাসীরদর কাছে বীর মুজাহিদদের আগমন কিংবা প্রস্থানের দৃশ্য অপরিচিত কোন বিষয় নয়।

এই আগন্তুক হলেন বাহাদূর মুজাহিদ ফররুখ! সলাত সমাপ্ত করেই আর বিলম্ব করলেন না তিনি; আরোহণ করলেন দন্ডায়মান অশ্বের পিঠে।শত সহস্র চিন্তা আছড়ে পড়ল তার মনের দুয়ারে।এই মুহুর্তে ভাবনার প্রধান বিষয় হল, ত্রিশ বছর পর তিনি বাড়ি ফিরলেন।কিন্তু এখন তিনি বাড়িটাই খুঁজে পাচ্ছেন না।নতুন নতুন বসতি আর পরিকল্পিত নগরায়নের কারণে তিনি বুঝতেই পারছেন না তার বাড়িটি আসলে কোন যায়গায় ছিল।তবুও বার বার খেয়াল করার চেষ্টা করছেন।মদীনার রাস্তা এবং গলি গুলো একের পর এক তিনি যেন অধ্যয়ন করছেন। অথচ তিনি জানেন না তার রেখে যাওয়া সেই বাড়ী কি আদৌ টিকে আছে না কি কালের স্রোতে তা বিলীন হয়ে গেছে চিরতরের জন্য।তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন তার সেই প্রিয়তমা স্ত্রী এখন কোথায়? কি করছে? স্ত্রীর শান্ত ও প্রসন্ন চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে যেন আবার মিলিয়ে যায়.... আর হ্যাঁ সে যে সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল তার কি খবর? স্ত্রী কি পুত্র সন্তান প্রসব করেছিল না কি কন্যা সন্তান? সে কি আজ বেঁচে আছে? কত বড় হয়েছে? কি করছে সে?.....স্ত্রীর কাছে তিনি যে বিরাট অংকের সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা কি সে ভোগ করতে পেরেছে? তা কি তার প্রকৃত উপকার বয়ে এনেছে?

অজস্র চিন্তার সাগরে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলছেন ফররুখ।হঠাৎ তিনি নিজেকে তার নিজ বাড়ির সামনে আবিষ্কার করলেন।আশার প্রদীপ জলেও আবার নিভে গেল হঠাৎই।স্মৃতি তাকে প্রতারিত করছে না তো? আবার হিসেব করে দেখলেন।নাহ কোন ভুল হয়নি তার।এই বাড়িটিই তার- এতে তার কোন সন্দেহ নেই।তবু আরও নিখুঁত ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করলেন।আবার! আবার! আবার!।দরজাটা ভেঙ্গে গেলেও এবার তিনি ঠিকই চিনেছেন।আনন্দের উল্কারা দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে হৃদয় আকাশে।পাশে কেউ থাকলে তার বুকের তড়পানি বুঝে ফেলত সহজেই।বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দ তাকে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ঠেলে দিল একদম বাড়ির আঙ্গিনায়। অনুমতি নেয়ার সুযোগ হল না তার।কিন্তু অনুমতি না নেয়ার খেসারত তাকে দিতে হল।..

বাড়ির দরজা দিয়ে কারো প্রবেশের শব্দ পেয়েছিলেন বাড়ির মালিক।নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বারান্দায় ।শুক্লা পক্ষের জোৎস্না ধোয়া রজনীর দীপ্তিময় প্রহর।মিষ্টি আলোর বন্যা চার দিকে।তিনি দেখলেন একটি লোক দাড়িয় আছে উঠানের ঠিক মাঝ খানে।হাতে সুসজ্জিত তরবারি; কিন্তু নিচের দিকে নামানো।এ আবার কে এই রাত-বিরাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল? বাড়ির মালিক বিস্ময় ও ক্ষোভ নিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে এলেন লোকটির সামনে।"আল্লাহর দুশমন! রাতের জন্য মনে করেছো তোমাকে দেখতে পাব না? রাতের মধ্যে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে হামলা করা তোমার মতলব?" একথা বলতে বলতে নির্মম ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।কু মতলব নিয়ে বাঘের ঘরে কেউ হানা দিলে বাঘ যেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলে ঠিক তেমনি মরিয়া হয়ে হামলা চালালেন এবং তাকে একটি কথা বলারও সুযোগ দিলেন না বাড়ি ওয়ালা।

একে অপরের উপর হামলা চালাল।তাদের চিৎকার এবং শোরগোল রাতের নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ছড়িয়ে পড়ল আশপাশের বাড়ী এবং রাস্তায়।আচানক হৈচৈ শুনে প্রতিবেশীরা হয়রান হয়ে ছুটে এলো চতুর্দিক থেকে।দেখতে না দেখতেই তারা বাড়ির মালিককে সাহায্য করার জন্য অনুপ্রবেশকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুহূর্তের মধ্যে তাকে লোহার শিকল দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলল।

এবার বাড়ির মালিক লোকটিকে শক্ত করে ধরে বলল: আল্লাহর দুশমন! ওয়াল্লাহে আমি তোমাকে ওলীর কাছে সোপর্দ না করে ছাড়ছি না।হাঁপাতে হাঁপাতে আগন্তুক লোকটি বলল: 'আমি আল্লাহর দুশমন নই এবং কোন অপরাধও আমি করিনি।এটা আমার বাড়ী এবং আমার অর্জিত সম্পদ।দরজা খোলা পাওয়ায় আমি ঢুকে পড়েছি। একথা কয়টা বলেই সে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকাল।বলল: 'হে লোক সকল!, তোমরা আমার কথা শোন! এটা আমার বাড়ী, আমি আমার সম্পদের বিনিময়ে এ বাড়ী ক্রয় করেছি।.....' কে শোনে কার কথা।সবাই মিলে টেনে নিয়ে চলল তাকে ওলীর দরবারে।

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই বাড়ীর ভেতর থেকে এক মহিলা কণ্ঠের আর্ত চিৎকার ভেসে আসতে লাগল। তিনি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন।নিজ বাড়িতে হঠাৎ হৈচৈ শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায়।দরজার আড়ালে কান পেতে চরম

উৎকণ্ঠা নিয়ে সব শুনছিলেন এতক্ষণ এবং পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলেন।বন্দীর শেষ কথাটা কানে আসার সাথে সাথে তিনি যেমন অবাক হলেন তেমন ভয়ও পেলেন।হয়তো পরিস্থিতি বুঝতে পরেছেন এবং বিপদের আশংকা করছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন উঠানের দিকে।বন্দির উপর নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি।বিহ্বলতা তাঁর জিহ্বাকে অচল করে দিয়েছে।ততক্ষণে বন্দীকে নিয়ে লোকেরা উঠান পেরিয়ে দরজার সামনে চলে গেছে।দ্রুত তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।চিৎকার দিয়ে বললেন: রবীয়া, তাঁকে ছাড়ো! হে লোকেরা, তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও।আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন! রাবীয়া! উনি তোমার পিতা 'ফররুখ'! মহিলার উপর্যপরি উচ্চ আওয়াজ আর্তনাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে অবিরাম।থেমে গেছে কাফেলা।কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাড়ীর মালিক রাবীয়া।রাবীয়ার মায়ের শেষ চিৎকার সবারই হৃদয় স্পর্শ করল, তিনি স্বামীকে ডেকে বলছেন: 'হে আবূ আব্দুর রহমান! যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে তোমারই ছেলে! তোমারই সন্তান!' সাবধান! তার কোন ক্ষতি করোনা !!!

বিস্ময়ে হতবাক উপস্থিত লোকেরা।তারা যেন কোন রূপ কথার শ্বাসরুদ্ধকর ও কল্পনাতীত এক অধ্যায়ের চিত্রায়ন দেখছে নিজ চোখে।শিকলে আটকানো ফররুখ বুকে টেনে নিলেন তার ছেলে রাবীয়াকে।মুয়ানাকা করলেন নিবিড় ভাবে।অন্যরা পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে সকলেই দ্রুত কেটে পড়ল যার যার মত।যাওয়ার আগে তারা সকলেই সৌজন্য মূলক ক্ষমা চেয়ে নিল পিতা ও পুত্রের কাছে।

রাবীয়ার মা স্বামীর কাছে নেমে আসলেন।যে স্বামী প্রায় তিনটি যুগ আগে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তারপর কোন খবরই ছিলনা তাঁর। এই জমিনের উপর স্বামীর সাথে আর কোন দিন সাক্ষাৎ হওয়ার ধারনাও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ছিল, স্বামী এ দুনিয়াতে বেঁচে নেই। অথচ সেই স্বামী এখন তাঁর সামনে উপস্থিত।কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না যেন।এ মুহূর্তে তাঁকে পেয়ে বসেছে এক পশলা লাজুকতা।

নিস্তব্ধ রজনী! স্ত্রীর পাশে বসে আছেন ফররুখ।নিজের অতীত অবস্থা তুলে ধরছেন স্ত্রীর কাছে।..এতো দিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশের কারণ, কোন খবর দিতে না পারার কারণ ইত্যাদি শোনাচ্ছেন স্ত্রীকে একের পর এক।কিন্তু স্ত্রী তার অনেক কথায় হাঁ, হুঁ, যোগালেও তার মনোযোগ নেই স্বামীর এই আলাপচারিতায়।তার মন তখন অন্য এক স্থানে ব্যস্ত।সেখানে বিরাজ করছে বড় একটি আতঙ্ক।আর তা হ'ল, 'তার স্বামী তার কাছে বিরাট পরিমাণ যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা তো তিনি সবই শেষ করে ফেলেছেন, কোন সম্পদই আর বাকি নেই'- একথা কি তিনি মেনে নিবেন? একথা শুনে তিনি কি আচরণ করবেন? নাজানি চটে যান; এই আশঙ্কায় তিনি এখন অস্থির। স্বামীর কথার প্রতি তাঁর কোন মনোযোগ নেই।স্বামীর সাথে তাঁর এই অভাবনীয় সাক্ষাৎ কিংবা সন্তানের সাথে পিতার এই মধুর মিলন তার হৃদয়ে স্থায়ী জোয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি।

তিনি ভাবতে থাকেন: তোমার সব সম্পদ তোমার ছেলের উন্নত শিক্ষা এবং উত্তম প্রতিপালনে খরচ করেছি' একথা কি তিনি মেনে নিবেন? একটি সন্তান প্রতিপালনে কি ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হয়? তিনি কি বিশ্বাস করবেন, তার ছেলেটি যে ঐ আকাশের চাইতে উদার এবং দানশীল? দ্বীনের স্বার্থে দু'হাত দিয়ে অকাতরে দীনার খরচ করেছে তার ছেলে- কিভাবে বিশ্বাস করাবো তাঁকে এসব কথা?

‘উম্মু রাবীয়া!’ হঠাৎ এই ডাক শুনে খানিকটা ঘাবড়ে যান রাবীয়ার মা।নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন তিনি।তার মানসিক অবস্থা কি তাঁর স্বামী অনুমান করে ফেলেছে? নিজেকে জিজ্ঞেস করেন, কৃত্রিম গাম্ভীর্যতা টেনে স্বামীর ডাকের জবাব দেন তিনি।

ফররুখ বললেন: ‘তোমার জন্য নগদ চার হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে এসেছি।আর আগে যা রেখে গিয়েছি সেখান থেকে যা আছে তা বের কর।একত্র করে একটা বাগান অথবা এক খণ্ড জমিন খরিদ করবো।আগামী দিন গুলো উৎপাদিত ফল-ফসল দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে’।একথা শুনে উম্মু রবীয়া গাফেলের মত নিরুত্তর হয়ে বসে রইলেন।কোন উত্তর দিলেন না।ফররুখ আবার ঐ সম্পদ বের করতে বললেন।আর বললেন: জলদী কর, কোথায় ঐ দীনার গুলো? যাও নিয়ে আসো।এগুলো সহ একত্রিত করে দেখি কত হয়!

‘যেখানে রাখা ওয়াজিব ছিল সেখানে রেখে দিয়েছি। কিছু দিন পর তোমাকে বের করে দেব ইন শা আল্লাহ!’ অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন উম্মু রাবীয়াহ!

তাদের আলাপচারিতা হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো।কিন্তু আযানের ধ্বনি তা থামিয়ে দিল।মাসজিদুন নববী থেকে ভেসে আসলো ফজরের আজান।বাহিরের দিকে পা বাড়াল ফররুখ, ওজু-ইস্তিঞ্জা সেরে তাড়াতাড়ি বাহির দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন ‘রাবীয়া কোথায়? সে মসজিদে যাবে না? তাকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দাও! জলদি করো!... ’

‘সে তো আপনার আগেই মসজিদে চলে গেছে সেই প্রথম আযানের সময়।তাহাজ্জুদও সে ওখানেই আদায় করে।আর জামায়াত পেতে আপনাকে দ্রুত পাঁ চালাতে হবে, আপনার বের হতে অনেক দেরী হয়ে গেছে!’ জবাব দিলেন রবীয়ার মা।

ফররুখ মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখলেন ইমাম সাহেব ছলাত সমাপ্ত করে ফেলেছেন।তাই একাকী ছলাতটা আদায় করলেন তারপর চললেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর কবরের দিকে।প্রথমে আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তারপর তাঁর প্রিয়তম দুই সাথী আবূ বকর ও ওমরের রা. উপর সালাম এবং দরূদ পাঠ করলেন।তারপরই ছুটলেন রওজা শরীফ (*রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর কবর নয়; কবর এবং তাঁর মেম্বারের মাঝখানের স্থান*) এর দিকে।বহু দিন থেকে তাঁর বুকের মধ্যে এই স্থানটিতে ছলাত আদায় করার ব্যাকুলতা বিরাজ করছে।সূর্য উদিত হওয়ার পর, একটুখানি খালী যায়গা দেখে সেখানে প্রাণভরে নফল ছলাত আদায় করা শুরু করলেন মা শা আল্লাহ! আল্লাহ যা তাওফীক দিলেন নফল ছলাত আদায় করার পর যা যা তাঁর মনে আসল মনের দরজা খুলে দিয়ে অনেক দুয়া করলেন।

ছলাত সমাপ্ত করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার কথা ভাবতেই তিনি খেয়াল করলেন মসজিদ প্রাঙ্গণ মানুষের ভিড়ে কানায় কানায় ভরে গিয়েছে।মসজিদে রাসূলের মিম্বারকে কেন্দ্র করে লোকেরা ঘিরে বসেছে।যেন মৌচাকে চুপচাপ বসে আছে মৌমাছিরা।কোথাও পা রাখার মত খালি যায়গা রাখেনি।জনগণের দিকে চোখ ফিরাতে গিয়ে তিনি দেখলেন উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক বৃদ্ধ এবং মুরুব্বীগণ বসে আছেন সেখানে।আরও দেখলেন বহু সম্মানিত লোকও আছেন তাদের মধ্যে; ব্যক্তিত্ব এবং আভিজাত্যের ছাপ তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে।দারস শুরু হওয়ার আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করেছে।কিন্তু অসংখ্য যুবককে দেখে একটু আফসোস হল তাঁর, বেচারারা বসার যায়গা না পেয়ে হাঁটুর ভরে দাঁড়িয়েই বক্তব্য শুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।তাদের হাতে খাতা কলম।মনি-মুক্তা লুফে নেয়ার মতই দ্রুত টুকে নিতে শুরু করলো সম্মানিত শায়খের বক্তব্য।

ইলমের এতো বড় মজলিস ফররুখ জীবনে আর কখনো দেখেননি।তিনিও বসে থাকলেন তাদের সাথে। লোক জনের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ঐ দিকে নিবদ্ধ- যে দিকে সম্মানিত শাইখ বসে তাকরীর পেশ করছেন।তাঁর প্রতিটি শব্দ মানুষ এতো নীরব হয়ে শুনছে যে, মনে হচ্ছে তাদের মাথায় যেন কোন পাখি বসে আছে।দূরত্বের কারণে অনেকে শাইখকে দেখতে না পেলেও তাঁর প্রতিটি বক্তব্য একেকটি পরিচ্ছেদ আকারে লিখে চলেছেন তারা। যারা শায়খকে দেখতে না পেয়েও তার বক্তব্য শুনছেন তাদের মধ্যে ফররুখও এক জন।তিনি শায়খকে এক নজর দেখার চেষ্টা করতে চেয়েও করলেন না।কারণ, একে তো দূরে, তা ছাড়া অন্যেরা বিরক্ত হবেন বা তাদের মনোযোগ বিঘ্নিত হবে।

ফররুখ মসজিদে নববীতে বসে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর অমিয় বাণীর আলোকময় ব্যাখ্যার এক প্রাণবন্ত উপস্থাপনা শুনছেন।সম্মানিত শায়খের বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তি তাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করলো।গো গ্রাসে গিলছেন তিনি মূল্যবান এই হাদীছের দারস।

কিছুক্ষণ পর দারস শেষ হল।শায়খ হয়তো উঠে দাঁড়িয়েছেন বিদায় নেয়ার জন্য।আর অমনি শিক্ষার্থীবৃন্দ হুড়মুড় করে ছুটল উস্তাদজীর দিকে।ঠেলাঠেলি করে চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরেই ফেলল।নিজেরা ভিড় শামলিয়ে শাইখকে যখন রাস্তা করে দিচ্ছিল তখন ফররুখ পাশে উপবিষ্ট এক লোককে সম্বোধন করে বললেন: আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন কে এই শায়খ?

‘ আপনি এই শহরের অধিবাসী নন?’ বিস্মিত হয়ে জবাব দিলো লোকটি।

‘জি হ্যাঁ’।জবাব দেয় ফররুখ।

‘এই নগরীর এমন কেউ আছে না কি, যে এই শায়খকে চেনে না?’ বলল লোকটি।

‘এটা আমার দুর্ভাগ্য এবং আমি আমার দুর্ভাগ্যের কথা স্বীকার করছি। ফররুখ জবাব দেন। তিনি আরো বলেন,‘কারণ আমি প্রায় বহু দিন শহরের বাইরে ছিলাম।এই গত কাল ফিরেছি মাত্র।

‘ও আচ্ছা, তাই বলেন’! বলেই লোকটি বলল ‘আচ্ছা আমার কাছে কিছুক্ষণ বসেন আমি শায়খের পরিচয় আপনাকে বলছি।

‘জি ঠিক আছে। একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে বসতে বললেন ফররুখ।

‘যে শায়খের আলোচনা এতক্ষণ আমরা উপভোগ করলাম..’ শুরু করলো লোকটি। ‘তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ তাবীঈদের একজন এবং তিনি মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম নিদর্শন।তিনি মদীনার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফক্বীহ এবং ইমাম; যদিও তাঁর বয়স অনেক কম। এক শ্বাসে কথা গুলো বলে দম নিলো লোকটি।

‘মা শা আল্লাহ! লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! সব কিছু তাঁরই ইচ্ছা!’ কথার ফাকে বললেন ফররুখ।

এর পর লোকটি আবার বলতে লাগল: ‘তাঁর মজলিসে ছাত্রদের সারিতে উপস্থিত থাকেন মালেক বিন আনাস, নু’মান বিন ছাবেত (আবূ হানীফা), ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল আনসারী, সুফিয়ান আছছাওরী, আব্দুর রহমান ইবনু আমর আল আওযায়ী, আল্লাইছ ইবনু সা’দ প্রমুখ।

‘তবে আপনি কিন্তু তাঁর পরিচয়টাই.....

ফররুখকে তার কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে চলল লোকটি: ‘আর সব কিছুর উপর বড় কথা হল ইনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত বিনয়ী, উদার এবং তিনি.....এবং. .....এবং.....মদীনা বাসীগণ তাঁর চাইতে বন্ধু পরায়ণ, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত এবং আল্লাহর নিকট রক্ষিত সম্পদ লাভের জন্য এতো বে-ক্বারার আর কাউকে চেনে না।

‘তবে আপনি কিন্তু তাঁর নামটা আমাকে বলেননি। বললেন ফররুখ।

‘জি, ও হ্যাঁ।তাঁর নাম: রাবীয়াতুর রায়।বললেন লোকটি।

‘রাবীয়াতুর রায়’! বিস্ময় ঝরে পড়ল ফররুখের মুখে।

‘আসলে তার নাম “রবীয়া” ।আবার বলতে লাগল লোকটি: কিন্তু মদীনার উলামা বৃন্দ এবং তাঁর মাশায়েখ বৃন্দ তাঁকে রাবীয়াতুর রায় নামে ডেকে থাকেন।কারণ কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা যখন পবিত্র কিতাবুল্লাহ কিংবা হাদীছে রাসূলের মধ্যে কোন নছ বা মূল উদ্ধৃতি খুঁজে পান না, তখন তাঁরা এই যুবকের

শরণাপন্ন হন; তখন তিনি ইজতিহাদ করেন এবং একই প্রকৃতির দলীল সমৃদ্ধ কোন বিষয়ের সাথে দলীল বিহীন সমস্যাটিকে তুলনা করেন এবং তাদেরকে এমন প্রজ্ঞা-পূর্ণ জবাব উপহার দেন যে, তারা পরিতৃপ্ত এবং বিমুগ্ধ হয়ে তা গ্রহণ করেন।(রবীয়া অর্থ বসন্ত, এবং রায় অর্থ মতামত অর্থাৎ বসন্ত ঋতু যেমন তার রকমারি ফুল ও পাখির কলকাকলি এবং সজিবতা দ্বারা মানুষের মনে শান্তির জোয়ার প্রবাহিত করে, ঠিক তদ্রূপ সুন্দর সুন্দর গবেষণা দ্বারা যিনি মানুষের অন্তরে বসন্ত এনে দেন তিনি হলেন রাবীয়াতুর রায়)

ফররুখ খানিকটা আফসোসের সূরে বললেন: ...ইয়ে, মানে, তার বংশ পরিচয়টা কি আপনার জানা আছে?

'তিনি হলেন ফররুখের পুত্র রবীয়া'। গর্বের সাথে জবাব দিলো লোকটি: তাঁর বাবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।তাঁর মা তাঁকে আদর যত্ন ও স্নেহ - মমতা দিয়ে পালন করেন।একটু বিরতি নিল লোকটি তারপর বলল: ছলাতের খানিক পূর্বে এক লোকের মুখে শুনলাম, তারা বলাবলি করছিলো যে, সম্মানিত শায়খের বাবা নাকি গত রাতে ফিরে এসেছেন।একথা শুনার সাথে সাথে ফররুখের দু'চোখে অশ্রু চিকচিক করতে লাগল।মুহূর্তেই তা অবাধ্য বন্যার রূপ নিল এবং প্রবাহিত হতে শুরু করলো দুগন্ড বেয়ে। তিনি আর কোন কথা না বাড়িয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন তারপর হাঁটা দিলেন সোজা বাড়ির দিকে।কিন্তু লোকটি এর কোন কারণ খুঁজে পেল না, সে জানলনা যে পিতার কাছে তারই পুত্রকে নিয়ে সে গর্ব করছিল এতাক্ষণ।

রাবীয়ার মা স্বামীর চোখ ভরা অশ্রুর বন্যা দেখে ঘাবড়ে গেলেন এবং মমতা জড়ান কণ্ঠে বললেন কি ব্যাপার রবীয়ার বাবা! কি হয়েছে তোমার? তোমার চোখে পানি কেন? ফররুখ বললেন: না না, খারাপ কিছু ঘটেনি।তারপর তিনি স্ত্রীকে সামনে বসিয়ে ভেজা ভেজা কণ্ঠে বললেন: আমি আমাদের ছেলে রাবীয়াকে জ্ঞানের যে মাক্বামে দেখলাম সে স্তরে ইতি পূর্বে আর কাউকে কখনো দেখিনি।এমন মহত্ব এবং এমন মর্যাদাও কারো জন্য কখনো দেখিনি।এদৃশ্য নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মত নয় উম্মু রাবীয়া! আমি আমার নিজ চোখে রাবীয়ার জ্ঞানের যে স্থান এবং তার প্রতি ইসলামের মুবাল্লিগদের যে অজস্র ও বিদগ্ধ শ্রদ্ধা দেখলাম তা বিবরণ দিয়ে ফুটিয়ে তুলা যাবে না।আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন! আনন্দের অশ্রু যেন বাঁধ মানছে না।

'আল হামদু লিল্লাহ!' স্বামীর সাথে সাথে স্ত্রীও আল্লাহর প্রশংসা করলেন।তারপর পরম শ্রদ্ধার সাথে বললেন: এবার বল তোমার ছেলে- মর্যাদা এবং জ্ঞানের যে স্তরে উপনীত হয়েছে তা অধিক উত্তম না কি ত্রিশ হাজার দীনার তোমার কাছে অধিক উত্তম? তোমার কাছে কোনটা অধিক প্রিয় ?

ফররুখ বললেন: আল্লাহর কসম এটিই আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং এটি তামাম দুনিয়ার সম্পদের চাইতে আমার কাছে অনেক অনেক উত্তম!

রবীয়ার মা বলেন: 'তুমি আমার কাছে যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলে তা এই ছেলের উন্নত শিক্ষার জন্য সবই খরচ করে ফেলেছি।তুমি কি তাতে মন খারাপ করবে '?

ফররুখ বললেন কক্ষনই নয়।বরং তোমার এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে, রবীয়ার পক্ষ থেকে এবং সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের পক্ষ থেকে উত্তম পুরষ্কার দান করুন!

সমাপ্ত